জীবনানন্দ ঃ আখ্যান মঞ্জরীতে সমসময়

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

জীবনানন্দের আখ্যান মঞ্জরীতে সমসময় বলতে কী ? কার সমসময় ? তাঁর না আমাদের আমার জিজ্ঞাসা
কি হবে জীবনানন্দের উপন্যাসে তাঁর সমসময় কী ভাবে উঠে এসেছে। নাকি, আমাদের সমসময়ে তিনি কতটা প্রাসঙ্গিক-- সেটা ? চারটির বদলে যদিও মাত্র দুটি অপসন, এবং কোনও লাইফ লাইন নেই-- তবু এর সদুত্তর আমার জানা নেই। অতএব, যে-কোনও একটি ধরে ঝুলে পড়ার তুলনায় আমি দুটি দিক থেকেই দুটো - একটা কথা বলি।শুধু ছুরি নয়, দে াফলফলা কাঁচিও কাটা কুটিতে ব্যবহৃত হয়। যদিও otology of difference বলেও তত্ত্বকথা আছে, ছোটমুখে সে বড় কথায় না গিয়ে শুধু মাত্র কাঁচি হাতেই এটুকু বুঝতে পারছি-- তার পদ্য ও গদ্য এই দুটি ফলার মধ্যে অধস্তন ফলকটির ক াজ অনিবার্য হলেও অপেক্ষাকৃত নিষ্য়। অর্থাৎ, তাঁর গল্প ও উপন্যাস।

জীবনানন্দের রচনায় সবসময় নিয়ে ভাবতে গিয়ে যদি শুধু কবিতার দিক থেকে ভাবি--- তাহলে দেখব, বঙ্গভঙ্গের সময় ১৯০৫ -এ তাঁর বয়স ৬ বছর, ১৯৪১-এ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু - সময়ে ৪২--- এখন দুই সন্তানের পিতা-- ধূসর পান্ডুলিপি বছর পাঁচেক আগেই বেরিয়ে গেছে। ১৯৪৬-এ দাঙ্গা। ১৯৪৭-এ দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা-- এ-সব থেকে তাঁর মৃত্যু ম াত্র ৭ বছর দূরে। তাঁর কবিতায় সমসাময়িকতা বিষয়টি অন্য কোনও নিবন্ধে উপস্থাপনার বিষয় ধরে নিয়েও আমি অকপটে স্বীকার করতে পারি যে, তাঁর সমকালীন সময়ের রিরংসা, মৃত্যু, অবক্ষয় ও অবসাদ--ধকেতে রাত্রির বুকে এমন অনন্ত সূর্যোদয়ের আভাস আমরা আর কোনও বাঙালি কবিতে পাই না। আর সমকালীন রাজনীতি ও সমাজ-চেতনার সঙ্গে দ্বিধাহীন দায়বদ্ধতার কথা উঠলে-- অবস্থান বিপরীত মেতে হলেও-- সুকান্ত এবং সমরসেন দুজনে নিজ নিজ মাহ াত্ম্যে অক্ষুণ্ণ থাকা সত্ত্বেও-- আমাকে বোঝা এবং ভুলবোঝা দুটোই খুব সহজ হবে-- যদিবলি, সমকালীন রাজনীতি ও সমাজ তাঁর কবিতায় যে-রকম সর্বতোভাবে উঠে এসেছে--তেমনটি আর কোথাও নেই। একই সঙ্গে ইয়াসিন হানিফ মহ ম্মদ মকবুল করিম আজিজ ও গগন বিপিন শশি--- এদের হাত ধরে তিনি তাঁরইভাষায় শতাব্দীর অন্তহীন আগুনের ভিতর দাঁড়িয়ে। এই স্বতঃসিদ্ধ বিষয়টি অযথা যুক্তিতর্কায়িত করে পাঠকের সময় নষ্ট করতে আমি একদম চাই না। যদিও এটা বলতেই হবে যে পদ্যের মত গদ্যে-- উপন্যাস ও গল্পে-- তাঁর কবিতার সমাজ -মনুষকে আমরা সেভাবে পাই না। ঠিকই যে, সুতীর্থে শবিপ্লবের কথা বারবার আসে, জলপাইহাটিতে দেশভাগ--- নিপম যাত্রায় মার সঙ্গে টমাস মান-সহ ঝিরাজনীতির প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গেলে, মা বলেন-- এ-সব বিষয় তোমার আলোচনা করা উচিত বৌমার সঙ্গে ! এদিকে কণার রূপ গল্পে দেখি কবি ও ঔপন্যাসিক
সিদ্ধেরের সঙ্গে মুগ্ধ পাঠকের নিম্নলিখিত নিচুগলার কথাবার্তা ঃ
----আপনি তিনটি উপন্যাস লিখে সরে গেলেন কেন ?
----সে আজ বছর পনেরো আগেকার কথা। আর আমি কোনও উপন্যাস লিখিনি। চেষ্টাও করিনি।
আপনার কোনও উপন্যাসেরই দ্বিতীয় সংস্করণ হয়নি বটে। কিন্তু সে জন্য দায়ী আমাদের দেশের চির মলিনতা (-র দন)-- -।
----গদ্য যখন লিখতে আরম্ভ করি, তখন আমার বয়স ৩০ বছর। তারই বছর দুই আগে আমার বিয়ে হয়। পনেরোটি বছর স্ত্রী আমার জীবনে অধিকার করে রাখে। আমার স্ত্রী বেঁচে থাকা সত্ত্বেও তিনখানা উপন্যাস আমি যে লিখতেপেরেছি, এ-জন্য আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উটিত তোমাদের।
স্তম্ভিত, একেবারেই প্রোথিত হয়ে যেতে হয় দুর্বলের এই প্রবল স্বীকারোক্তির সামনে। দ্যাখো, গাছের চারাটি---আহা, কত নরম---কত দুর্বল ! অথচ, সেই তো উদ্ভিদ-- কী প্রবল পারাত্রমেই না মাটি উদ্ভেদন করে সেই তো বেরো ল। আর সে যখন সবল হল,কঠিন হল, তাকে পাবে ওই আসবাবে--- তখন মৃত। না, এত কথা লাওৎ- সে বলেন নি। তিনি শুধু

বলেছিলেন, দুর্বলতা জীবনের সহচর। সবলতা মৃত্যুর।
জীরনানন্দের গদ্যে আমরা মাটি, সম্ভবত মভূমি ফুঁড়ে উঠে প্রবল পরাত্রান্ত উদ্ভেদনের এক দুর্বল আত্মপ্রকাশই দেখি।
তুলনায় তাঁর কবিতা কিন্তু অনেক বেশি কুশলী, সপ্রতিভ এবং পুরাণকল্পের দৈত্য অ্যাটলাসের মতই প্রায় এম্পিডোক্লস থেকে হংকঙের তৃণ পর্যন্ত--- ত্রিভূবন বহুনক্ষম। কিন্তু, গল্পে- উপন্যাসের ক্ষেত্রে দুর্বলতাগুলির বিষয়েই আমাদের যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষ করে সেই সকল সময়ে, যখন মনে হবে, আরে, লোকটা তো লিখতেই জানে না। আমি আরও একবার বিদগ্ধ সারস্বত সমাজের সামনে এই বিষয়টি উদাহরণকন্টকিত করে সপ্রমাণ করার লোভ সংবরণ করলাম। মধুময় তামরস স্মৃতিজলে ফুটে থাকাই ভাল। সকলেই জানেন, বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনা অর্ঘ্যকুসুম মাত্রই মৃত। সকল উদাহরণ।
কারণ, তাঁর এই যে নিপম যাত্রা--- এ তো অপুর মত ছোট থেকে ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠার--- সেই নাগাড় নির্মাণের ব্যাপার নয়। শুধু নির্মাণের ব্যাপার নয় এ, একই সঙ্গে ভেঙেও যাচ্ছে।

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ ছাড়া-- আমি বিশেষত চাঁদের অমাবস্যার কথাই--- বলছি। এ- জিনিস আর কোথাও নেই। বাংলা গল্প - উপন্যাস শ্রেষ্ঠ উদাহরণগুলিও, সেই কপালকুন্ডলা থেকে শুধু নাগাড় নির্মাণের ইতিহাস-- ফর্ম ও কনটেন্ট--- পঞ্চাশের দশকের গদ্য লিখিয়েরাই প্রথম স্ট্রাকচার ভাঙলেন--- কিন্তু আজ মনে হয় সেও যেন শুধু শাবল আরগাঁইতি দিয়েই ভাঙা হল--- ভাষা নির্মাণের দায় কি দেবেশ রায়ও এড়াতে পারলেন ? আমি ওঁকে লেখক বলে মনে করি, তাই কাঠগড়ায় দাঁড় করালাম। নিজের ওপর আদ্যোপান্ত অবিশ্বাস রাখি---- লেখক হিসেবে তো অবশ্যই--- অন্যাতায় সবার আগে আমিই ওখানে দাঁড়াতাম। তাঁর গদ্য-রচনায় সমসময়ের রাজনীতি, ঐতিহাহিক অবস্থান, সমকালীন মানুষ---এ-সবের খরতর অনুপস্থিতির কারণ যাঁরা খুঁজবেন--- যাঁরা আগে গ্যারেজ ভাড়া করে তারপর খুঁজতে যাবেন গাড়ি--- তাঁরা অবশ্যই লক্ষ্য করবেন--- তাঁর প্রায় ১০০টি গল্প, অন্তত ৬ টি উপন্যাস (১টি অসম্পূর্ণ) লেখা ১৯৩০ থেকে ১৯৩৬-- মাত্র এই ৬ বছরে। তাঁর পান্ডুলিপি - চর্চার সুযোগ পেয়েছেন যাঁরা--- সেই ঐতিহাসক ত্রয়ী--- দেবেশ রায় আফসার আহমেদ ও ভূমেন্দ্র গুহরায়--- এঁরাও বুঝছেন গল্পগুলি, উপন্যাস--- ঠিক রবীন্দ্রনাথের বিপ্লবী ছবিগুলি যেমন--- একদম প্রেস কপিটি করে-- খোলামেলা কাগজে আদৌ নয়-- রীতিমত সেলাই করা পুষ্টু এক্সারসাইজ খাতায় লেখা--- পৃষ্ঠাসংখ্যা, প্যারাগ্রাফ, অধ্যায়, কাটাকুটি -- সবকিছুই সেখানে সযত্ন ও সুচিন্তিত--- এবং ভবিষ্যতের ভাবনা মাথায় রেখে ছোট ছোট কালো ট্রাঙ্কের মধ্যে রাখা ছিল। ৬০ বছরে কেবল পাতাগুলি হলুদ হয়েছে। ন্যাপ থলিন ছাড়া কোনও কার্যকর কীটনাশক না থাকা সত্ত্বেও পোকারা তা কাটতে সাহস করেনি।
কিন্তু যা বলছিলাম। ওই ৬ বছর ১৯৩০ থেকে ১৯৩৬--- জীবনানন্দের খুব সমসময় মনস্কতার সময়ও নয়--- এক ধরনের পান্ডুলিপি--পাঠক এ - রকম ওকালতি করতেই পারেন। কারণ, সেটা তো তাঁর ঝরা অথবা মরা পালক খসাবার সময়। ধূসর পান্ডুলিপি-ই এসেছে ১৯৩৬-এ। বালাবাহুল্য, এভাবে ভুলের কচুরিপানায় পান্ডিত্যের ডোবা ভরে ওঠে। কেননা, বোধ - এর মত কবিতা তত দিনে লেখা হয়ে গেছে। যদিও বাল্মীকির মা নিষদা -এর পর ভারতীয় কবিতায় যা শ্রেষ্ঠ উচচারণ সেই---
তিমিরহননে তবু অগ্রসর হয়ে / আমরা কি তিমিরবিলাসী / আমরা তো তিমিরবিনাশী হতে চাই / আমরা তো তিমিরবিনাশী--
সাতটি তারার তিমিরের মেঘসমাগমে এ আর্ত কেকাধবনি তখনও শোনা যায়নি। কৃষ্ণচৈতন্য তার গদ্য রচনার কুত্রাপি পাওয়া যাবে না। জানতেন কি সে-কথা ! আর সেজন্যই লুকিয়ে রেখেছিলেন ১০০ টি গল্প (রবীন্দনাথের দ্বিগুণ) এবং - ছয়টি উপন্যাস ? বোধ হয় না। বরং তার উল্টোটাই হয়ত ঠিক। আমি আগেই জানিয়েছি, এই গদ্য- পান্ডুলিপি ছিল অতি সুপ
রিকল্পিত, সযত্ন রক্ষিত ও সুসম্পাদিত। এবং এগুলি, উদাহরণস্বরূপ, বিভূতিভূষণে শিশুর হামাগুড়ি থেকে উক্ষিত হয়ে, জীবনের পথে হেঁটে যাবার ত্রম-অনুযায়ী ইতিহাস নয়। তাঁর কবিতা যেমন ভাঙতে ভাঙতে শেষ পর্যন্ত নিজগুণে দাঁড়িয়েই থাকে-- যেভাবে পৃথিবীর সুন্দরীতমা নারীমুর্তি ভাঙতে ভাঙতে আজও ডানাজুড়ে বসে আছে-- পিরামিড থেকে

অদূরে-- সময় তার নাক ভেঙে দিয়ে গেছে বলেই যাকে তিলোত্তমা বলে মনে হয় । এ সেইরকম। একতিল কম তিলোত্তমা।

আমি শুতে লাওৎ-সেরা কথা বলেছিলাম। বস্তুত, জীবনানন্দর সমগ্র গদ্যরচনা লাওৎ - সে কথিত সে মহামান্য প্যারাবেলটি যেন। কী হয়েছিল, এক উদ্ভিদ- জ্ঞানী-- ২৫০০ বছর আগের কথিত গল্পে ওল্ড মাস্টার বলা হয়েছিল তাঁকে -- তাঁর নামও ছিল ওল্ড দং--- শিষ্যরা একদিন বলল, হে জ্ঞানবৃদ্ধ, আপনার তো এবার দেহরক্ষা করার সময় হল। অথচ গাছপালা সম্পর্কে আপনার স্বোপার্জিত বিদ্যার কিছুই আমাদের বলে গেলেন না। তবে কি আপনার মহাজ্ঞানও অবলুপ্ত হবে ?
বৃদ্ধ দং নড়েচড়ে বললেন। তাই তো, এ-কথা তো আমার মনে হয়নি। তিনি বললেন, চলো, চলো। এখনও খুব দেরি হয়নি। তোমাদের এখনই সমস্ত গাছপালা ও তাদের গুণাগুণ বিষয়ে শিখিয়ে দিই।
বেশ কয়েকটি জঙ্গল তিনি শিষ্যদের নিয়ে ঘুরলেন। সব গাছ দেখা ! জানা হল। অনেক গাছ দেখিয়ে বললেন, একে আদর করো। মনে মনে কোলে তুলে নাও। একে আলিঙ্গন করো। কিছু গাছের সামনে দাঁড় করিয়ে উনি শিষ্যদের বললেন, এঁদের প্রণাম করো। এগুলি ওষধিবৃক্ষ। তারপর তাদের গুণকীর্তন করলেন। শিক্ষা শেষে একজন শিষ্য বলল, কিন্তু, সিংলিং অরণ্যের ওই যে ৯০ হাত উঁচু বিশাল গাছটা যা আপনি বললেন ২৫০০ বছর বেঁচে আছে তার সম্পর্কে তো কিছু বললেন না ওল্ড দং !
ওটা ? ওল্ড মাস্টার বললেন, দূর দূর। ওটা এক অতি অপদার্থ বৃক্ষ। বৃক্ষসমাজের দায়--- বিশেষ বা লজ্জা। ওই গাছটা মস্ত বটে কিন্তু ওর কোনও গুণপনা নেই। দরজা জানালা বানালে ঝুরঝুর করে ভেঙে যাবে। নৌকো কী জাহাজ বানালে--- বন্দর ছাড়লেই যাবে ভু স করে ডুবে। দেখলে না, ফল হয় না। ফুল হয় না। একটা পাতাও নেই--- একেবারেই নির্গুণ। এর মত অপদার্থ জঙ্গলে আর দুটি নেই।

সেদিন রাত্রে গাছ বুড়ো দংকে স্বপ্নে দেখা দিল। বলল, আঁচছা, বুড়ো দং, তুমি তো একথা শিষ্যদের বললে না যে শুধু অপদার্থ ও গুণপনাহীন বলেই--- আমার গায়ে আজও একবারও কুড়ুলের ঘা পড়েনি। আমার ডালপালা কেউ কেটে নেয়নি। আর তাই আমার বয়স২৫০০ বছর আর আমি ৯০ হাত উঁচু ?

লঘু - মুহূর্তের সেই তিনজন অত্যন্ত-প্রশান্ত-হল মন আধো আইবুড়ো ভিখারির মনের কথা মনে আসে। ধন-দারিদ্র্য ছাড়িয়ে ভিকারির প্রকৃত সংজ্ঞা যে তার অপদার্থতায় - অব্যুটত্বে-জীবনানন্দের আগেই কেই-বা জানত !

১৯৭২ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং প্রকাশিত জীবনানন্দের গল্প থেকে গ্রাম ও শহরের গল্প রচনাটি আবারও লেখাটি পড়তে গিয়ে আমি এই প্রথম আবিষ্কার করলাম, ওটি গল্পও নয়, কবিতাও নয়--ওটি ফর্ম ও কনটেন্টে আসলে একটি মাধ্যাকর্ষণহীনতা--- যেমন শাগালের পেইন্টিং। ওখানে পনেরো মিনিট ধরে নায়িকা শচী একটি রেকর্ড হাতে দাঁড়িয়ে । ভাবছে। যে বাজাবে, না, বাজাবে না ! এবং ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছে।

হে সুধীসমাজ আমার এই নবতম উপলব্ধিকে অন্তত হাস্যকর মনে করবেন।
১৯৩২ -এ লেখা এই গল্প আমরা পড়তে পেলাম ১৯৭২ -এ ইউরোপে যার নাম ট্রায়াল, এখানে সেটাই তো মাল্যবান বই হয়ে বেরোল ৩০ বছর পরে। সবার আগে যে সে দেখা দিল সবার পরে। চাঁদের অমাবস্যা ইতিহাস ও ইমপ্যাক্টের দিক থেকে পরে এসেও মাল্যবানের পুর্বসূরি। সময়ের একি নির্মম কৌতুক। কবির নিজের হাতে তৈরি প্যারাডক্সের এ বেদনাময় ত্রুশকাঠ মাল্যবান বাংলা গদ্য সাহিত্যকে চিরকালই আপন বধ্যভূমির দিকে নিয়ে যেতে হবে।

২২ - ০৫ - ২০০০ / বোবাযুদ্ধ